পটচিত্রকথা

পট। বাংলার বিশিষ্ট লোকসংস্কৃতির অংশ। আজ বিলুপ্তির পথে হাঁটা এই চিত্রকথার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিচ্ছেন প্রকাশ দাস বিশ্বাস।

পট শব্দটি এসেছে সংস্কৃত পট্ট কথাটি থেকে যার অর্থ হল বস্ত্র। চলতি কথায় পট হল কাপড় বা কাগজের উপর বিশিষ্ট ঢঙে আঁকা চিত্র বা চিত্রাবলী। বিশিষ্ট লোকসংস্কৃতিবিদ আশুতোষ ভট্টাচার্যের মতে, বহু আগে পট আঁকা হত চটের উপর। প্রথমে কাদা ও গোবরের মিশ্রণ দিয়ে চটের যেদিকটায় ছবি আঁকা হবে সেদিকটা মসৃণ করে নেওয়া হত। তা শুকিয়ে গেলেই আঁকা হত ছবি। পরে অবশ্য চটের জায়গা নেয় কাপড় বা তুলট কাগজ। যদিও অষ্টাদশ শতাব্দীর আগের কোন পটশিল্পের নিদর্শন এখনো আবিষ্কৃত হয়নি তথাপি লোকশিল্পের এই ধারাটি যে বেশ পুরোনো তা নানা পুঁথিপত্রের বিবরণ থেকে বেশ বোঝা যায়। সপ্তম শতাব্দীর প্রথম পাদে রচিত বাণভট্টের হর্ষচরিত-এ যমপট ব্যবসায়ীর কথা আছে। অষ্টম শতাব্দীতে রচিত বলে অনুমিত বিশাখদত্তের বিখ্যাত নাটক মুদ্রারাক্ষস-এও যমপটের উল্লেখ আছে। মুকুন্দরাম চক্রবর্তী তাঁর কবিকঙ্কন চণ্ডীতে লিখেছেন, ‘পট পড়িয়া বলে কেহ নগরে নগরে।’ মুকুন্দরাম কথিত এই ভ্রাম্যমান চিত্রশিল্পীরা আজো মুর্শিদাবাদ, বীরভূম, বাঁকুড়া, মেদিনীপুরের পথে পথে পট দেখিয়ে গান শুনিয়ে বেড়ায়। পটই এদের জীবন জীবিকা।

যারা পট লেখে (এরা পট আঁকা বলে না বলে পট লেখা) তারা পটুয়া নামে পরিচিত। পট শব্দের সঙ্গে সম্বন্ধবাচক ‘উয়া’ প্রত্যয় যোগে পটুয়া কথাটি এসেছে। অঞ্চলভেদে পটুয়ারা পউট্যা, পউটা, পোটো নামে পরিচিত। এরা নিজেদের চিত্রকর জাতি বলে পরিচয় দেয়।

প্রচলিত কিংবদন্তী অনুযায়ী পটুয়ারা হলেন বিশ্বকর্মার বংশধর। দেবাদিদেব মহাদেবের বিনা অনুমতিতে তাঁর ছবি আঁকার পর পটুয়াদের আদিপুরুষ তা গোপন করার জন্য তুলি মুখে পুরে তা গোপনের চেষ্টা করলে মহাদেব তা দেখে ফেলেন। তুলি এঁটো করার দায়ে মহাদেবের অভিশাপে এরা জাতে পতিত হয় এবং ‘মুসলমানের রীত’ ও ‘হিন্দুর ধর্ম’ করতে আদিষ্ট হয়। সেই থেকে চিত্রকর পটুয়ারা মুসলমানদের মতো নামাজ করে ও হিন্দুর মতো দেবদেবীর ছবি আঁকে ও তাঁদের মহিমা কীর্তন গান করে।

ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণের দশম অধ্যায়েও পটুয়া বা চিত্রকর জাতির উদ্ভব নিয়ে অনুরূপ একটি কাহিনী পাওয়া যায়। ব্রাহ্মণবেশী বিশ্বকর্মার ঔরসে গোপকন্যা বেশী অপ্সরা ঘৃতাচীর গর্ভে নয়টি পুত্রের জন্ম হয়। এই নয়পুত্র হলেন মালাকার, কর্মকার, শঙ্খকার, কুন্দিবক (তন্তুবায়), কুম্ভকার, কাংশ্যকার, সূত্রধর, চিত্রকার ও স্বর্ণকার। এই নয়পুত্রের মধ্যে চিত্রকার বা চিত্রকর হলেন পটুয়াদের আদিপুরুষ। ব্রাহ্মণ নির্দিষ্ট চিত্রপদ্ধতি অনুসরণ করে স্বতন্ত্র চিত্ররীতি অবলম্বণ করায় ব্রহ্মশাপে তারা জাতিতে পতিত হয়। সেই থেকে তারা না হিন্দু না মুসলমান হয়ে তারা এক প্রান্তিক জীবন যাপন করে। এরা নামাজ পড়লেও এদের নাম হিন্দুদের মতোই। পটুয়াদের সঙ্গে মুসলমান রীতিনীতির অনেক মিল থাকলেও এদের মধ্যে হিন্দু আচার অনুসারীরও অভাব নেই। কালিঘাটের পটুয়া ছিলেন বৃত্তিত্যাগী, তাদের বেশিরভাগই ছিলেন সূত্রধর সম্প্রদায়ভুক্ত।

বাংলায় সাধারণত দু-ধরণের পট প্রচলিত। চৌকাপট আর বহপট বা দীর্ঘপট। কালীঘাটের স্বয়ংসম্পূর্ণ একক পটগুলি হল চৌকাপট আর জড়ানো পটগুলি হল বহুপট বা দীর্ঘপট। বহুপটে ধারাবাহিক চিত্রাঙ্কণের মাধ্যমে কোন কাহিনী ফুটিয়ে তোলা হয় এবং কাঠি বা লাঠিতে জড়ানো পট ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখানোর সময় প্রাসঙ্গিক গান, আবৃত্তি কথকতার মাধ্যমে পটুয়া পটের কাহিনীটি বিবৃত করেন। এরা শুধু চিত্রকরই নন একইসঙ্গে গীতিকার, সুরকার এবং গায়কও।

চৌকাপটের উদ্ভব সম্ভবত কালীঘাটের মন্দির প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। সতেরো শতকে কালীঘাটের মন্দির প্রতিষ্ঠিত হয়। কালীর শহর কলকাতার অধিষ্ঠাত্রী দেবী কালীমায়ের মন্দির ঘিরে বাড়তে থাকে তীর্থযাত্রীদের আনাগোনা। তীর্থযাত্রীদের চাহিদার হাত ধরেই বিকশিত হয় কালীঘাটের পটশিল্প। প্রথমদিকে দেবদেবীর চিত্রাঙ্কণই পটের বিষয়বস্তু হলেও পরে সামাজিক বিষয়ও পটের উপজীব্য হয়ে ওঠে। ঊনিশ শতকের ইঙ্গ-বঙ্গ সমাজের নানা অনাচার শানিত ভঙ্গিতে উঠে আসে কালীঘাটের পটে। হঠাৎ ধনী হয়ে ওঠা বাঙালিদের কাছে তখন আমোদ মানে বাঈজীবিলাস, বুলবুলি লড়াই বা বিড়ালের বিয়েতে অকাতরে অর্থব্যয়। সাহেব মেমেদের সাথে সুরার স্রোতে ভেসে যাওয়া কৌলীন্যের অন্য নাম। দেশের নব্যশিক্ষিত সম্প্রদায়ের কাছে তখন দেশীয় চিত্রশিল্পের কোন কদর ছিল না। সদর মহলে অবহেলিত, অপমানিত দেশীয় এই চিত্রশিল্পটি ঠাঁই করে নিল অন্দরমহলে। নিত্যপূজা ও ধর্মীয় আচারপালনে পট হয়ে উঠল অপরিহার্য। কালক্রমে পটের পৃষ্ঠপোষক অন্দরমহলের নীরব ভাষাই যেন বাঙ্ময় হয়ে উঠতে থাকল পটের রেখায়। শিক্ষিত স্বামী বা ভাইদের ব্যভিচার অনাচারকে তীব্র কষাঘাতে বিঁধতে থাকলেন চিত্রকররা। সমকালে শিল্পসমালোচকরা যতই অবজ্ঞার চোখে দেখুন না কেন

সাধারণ মানুষের কাছে অসাধারণ জনপ্রিয় ছিল। তবে বেশিদিন এই গৌরব অক্ষুন্ন থাকেনি। কমবেশি একশ বছর ছিল এর আয়ুষ্কাল। ১৯২০ থেকে ১৯৩০ মধ্যেই কালীঘাটের পট ইতিহাস হয়ে যায়। ছাপাছবি সুলভ হওয়া এই শিল্পের মৃত্যু তরান্বিত করে।

জড়ান পট বা দীর্ঘপটে ধারাবাহিক ছবির মাধ্যমে বিবৃত হয় কাহিনী। গান ও আবৃত্তির সাহায্যে সেই কাহিনীকে আরো প্রাঞ্জল করে পটুয়া। বিশিষ্ট লোকসংস্কৃতিবিদ বোরহানউদ্দিন খান জাহাঙ্গীর জড়ান পটের চিত্রগত বৈশিষ্ট্য বলতে গিয়ে লিখেছেন 'এই পট দুই মাত্রিক : ভল্যুম, ম্যাস, পারসপেকটিভ বিহীন; সমান জমিতে দুই মাত্রিক অলংকারিক চিত্র। এই ধারাটি উড়িষ্যার দাক্ষিণাত্যের, সেই সঙ্গে আছে মাটির প্রতিমার ভল্যুম, নিশ্চল ম্যাস। ... জড়ান পটে চোখ দূরে যায় না, জমিন থেকে চোখ ঘুরে চলে ছবির মধ্যে, আর ছবি তো নানা দৃশ্যের সমাহার। জড়ান পটের উৎস নিশ্চিতভাবেই অজন্তার দেওয়াল চিত্র, ঐ চিত্রের নিকটতম প্রতিবেশী অন্ধ্র স্কুল।' (বাংলাদেশের লোকশিল্প)

আকার অনুসারে পটচিত্রকে দুভাগে ভাগ করা হলেও বিষয় ভিত্তিকে বাংলার পটচিত্রকে মোটামুটি চারভাগে ভাগ করা যায়। ১। সাঁওতাল উপজাতির জন্মবৃত্তান্ত ও তাদের মধ্যে প্রচলিত জাদুপট বা চক্ষুদান পট, ২। মৃত্যুর পর যমরাজার বিচার বিষয়ক যমপট, ৩। মুসলিম ধর্মযোদ্ধা গাজিদের বীরত্বব্যাঞ্জক গাজিপট এবং ৪। হিন্দু পুরাণ, রামায়ণ, মহাভারত, মঙ্গলকাব্য, রাধাকৃষ্ণের লীলা ও চৈতন্যলীলা বিষয়ক পট।

মূলত পুরুলিয়া, বাঁকুড়ার আদিবাসী চিত্রকররা সাঁওতালী উপকথার ভিত্তিতে সাঁওতালদের জন্মকথা পটের ছবিতে বিবৃত করেন। সাঁওতাল, ভূমিজ এবং বাংলাদেশের ভেদিয়া উপজাতির মধ্যে প্রচলন আছে জাদুপট বা চক্ষুদান পটের। এই শ্রেণির পটুয়ারা ইন্দ্রজাল জানে এই বিশ্বাস থেকেই তাদের পটের নাম হয়েছে জাদুপট। আদিবাসী পরিবারের কারো মৃত্যু হলে এই পটুয়ারা দ্রুত তার ছবি এঁকে ফেলে। চিত্রটি সবদিক দিয়ে সম্পূর্ণ হলেও তার চোখের মণিটি থাকে না। চিত্রকর ছবিটি দেখিয়ে মৃত ব্যক্তির পরিজনদের বলে যে মৃত ব্যক্তির আত্মা পরলোকে গিয়ে লক্ষ্যহীনভাবে ঘুরে বেড়াচ্ছে। যেহেতু তার চোখের মণি নেই সেহেতু সে বুঝতে পারছে না কিভাবে কোথায় তাকে যেতে হবে। যদি তাকে উপযুক্ত অর্থ ও পারিতোষিক দেওয়া হয় তবে সে অঙ্কিত চিত্রের মধ্যে মণিটি বসিয়ে দিতে পারে যাতে মৃত ব্যক্তি তার পথ খুঁজে নিতে পারে। সরল আদিবাসীরা এই কাহিনী বিশ্বাস করে এবং চিত্রকরকে যথাসাধ্য অর্থ ও পারিতোষিক দিয়ে চোখের মণি

আঁকিয়ে চিত্রটি সম্পূর্ণ করে নেয়। জাদুপটে পটুয়ারা পশুপক্ষীসহ নানা লৌকিক দেবদেবীর ছবিও এঁকে থাকে।

যমপটে যম বা ধর্মরাজের বিচারে দণ্ডিত ব্যক্তির নরকযন্ত্রণা আর পুণ্যবান ব্যক্তির স্বর্গসুখের দৃশ্যাবলী আঁকা হয়। ইহজীবনে ন্যায় কাজের পুরষ্কার বা অন্যায় কাজের জন্য শাস্তিভোগ-এর চিত্র দক্ষহাতে ফুটিয়ে তুলে লোকশিক্ষকের ভূমিকা পালন করে পটুয়ারা। অনেক সময় যে কোন জড়ান পটের শেষেও আঁকা হয় যমপট। বিশেষজ্ঞদের মত অনুযায়ী এর 'রচনাশৈলী অমার্জিত। যমপটের গুরুত্ব অবশ্যই শিল্পকর্ম হিসাবে নয়, নীতি-শিক্ষার বাহক হিসাবে।' (বাংলার চিত্রকলা)

গাজির পট প্রকৃতপক্ষে মুসলমানি পট। এতে মুসলিম ধর্মযোদ্ধা গাজি এবং পীরদের বীরত্ব ও অলৌকিক ক্রিয়াকলাপ বিবৃত হয়। তবে মুসলমানি পট হলেও এই শ্রেণির পটে ব্যাঘ্রদেবতা দক্ষিণরায় বা বনবিবির ছবিও আকছার দেখা যায়। পটুয়াদের অসাম্প্রদায়িক ধর্মবোধের পরিচায়ক এই পটগুলি।

সবচেয়ে বৈচিত্র্যপূর্ণ পট হল চতুর্থ শ্রেণির পটগুলি। বিষয়বৈচিত্র্যে যেমন এ শ্রেণির পটের তুলনা মেলা ভার তেমনি অঙ্কণশৈলিতেও এই পট শ্রেষ্ঠতার দাবীদার। পুরাণ, রামায়ণ, মহাভারত, কৃষ্ণলীলা, মনসামঙ্গল সহ অন্যান্য মঙ্গলকাব্য, চৈতন্যজীবন থেকে আহৃত আখ্যান লোকশিল্পীদের তুলিতে জীবন্ত হয়ে ওঠে। এদের শৈল্পিক দক্ষতায় মুগ্ধ সমালোচক তাই বলেন, 'লৌকিক শিল্পীর বোধ ও মার্গরীতির বোধের মধ্যে প্রকৃত অর্থে কোন গুণগত পার্থক্য ছিল না, যা ছিল তা মাত্রাগত।'

পটুয়ারা তাদের পরম্পরাগত জ্ঞান থেকে প্রকৃতি থেকেই নানা রঙ আহরণ করে। হলুদ রঙ সংগৃহীত হয় হলুদ বা আলামাটি থেকে। সবুজ রঙ সংগৃহীত হয় শিমপাতা বা হিঞ্চে শাকের রস থেকে। বেলপাতা শুকিয়ে গুঁড়ো করেও তৈরি হয় সবুজ রঙ। বেগুনি রঙ তৈরি হয় জাম বা পাকা পুঁই মুচুড়ি থেকে। খড়িমাটির সঙ্গে সামান্য নীল মিশিয়ে তৈরি হয় সাদা রঙ। খয়েরি রঙ তৈরি হয় চুন বা আলামাটির সঙ্গে খয়েরের টুকরো মিশিয়ে। লালচে রঙ তৈরি হয় পোড়ামাটি বা লাল গিরিমাটি থেকে। কালো রঙের জন্য পোড়ামাটির গা থেকে চেঁছে নেওয়া হয় ভুষোকালি। গাব গাছের শিকড় পুড়িয়েও তৈরি হয় কালো রঙ। পাকা তেলাকুচা থেকে পাওয়া যায় লাল রঙ। জেলাভেদে অবশ্য এই রঙের উৎসও আলাদা হতে দেখা যায়। রঙ গোলা হয় মাটির

খুরি বা নারকেলের মালায়। পটুয়াদের তুলি তৈরি হয় বাচ্চা ছাগলের ঘাড়ের লোম বা পেটের লোম থেকে। স তুলির জন্য অবশ্য ব্যবহৃত হয় কাঠবেড়ালির লোম বা বেজির লেজের চুল। অধুনা অবশ্য পটুয়ারা বাজার থেকে কেনা রঙ তুলির উপরই বেশি নির্ভর করছেন। শহুরে কৃত্রিমতা গ্রাস করছে লোকশিল্পের এই দেশজ ধারাটিকে। কোন রঙের সঙ্গে কোন রঙ মেশালে কোন রঙ পাওয়া যায় বা কিভাবে রঙের ঔজ্জ্বল্য এবং স্থায়িত্ব বাড়ে সে বিষয়ে পটুয়ারা যথেষ্ট অভিজ্ঞ। রঙ ভালোভাবে ধরানোর জন্য রঙের সঙ্গে মেশানো হয় বেল, গঁদ, শিরিশ বা নিমের আঠা। নিমের আঠা পটকে পোকামাকড়ের হাত থেকেও বাঁচায়। অনেক সময় তেঁতুলবিচি ভিজিয়ে সিদ্ধ করে তৈরি করা থকথকে কাই বা ডিমের কুসুমও রঙ ধরানোর কাজে ব্যবহৃত হয়।

লোকশিল্পের এই প্রাচীন ধারাটি আজ মৃতপ্রায়। কালিঘাটের পটশিল্পের ধারা কবেই বিলুপ্ত হয়েছে। ধুঁকতে ধুঁকতে কোনমতে টিঁকে আছে দীর্ঘপটের ধারাটি। পটশিল্পের অনেক ঘরানাই আজ বিলুপ্ত। মুর্শিদাবাদ জেলার গণকর ঘরাণা বিলুপ্ত। কোনমতে টিঁকে আছে কান্দি-খড়গ্রাম ঘরাণা। ছাপাছবি আজ সর্বত্র সুলভ। লোকশিল্পের পৃষ্ঠপোষক সাধারণ মানুষের কাছে আবির্ভূত হয়েছে অন্য আকর্ষণ। লোকরঞ্জণের জন্য তো নয়ই, লোকশিক্ষার জন্যও পটুয়ারা আর অপরিহার্য হয়। পৃষ্ঠপোষকতার অভাবে পটুয়ারা আজ বাপ ঠাকুরদার পেশা ছেড়ে বেছে নিচ্ছে অন্য বৃত্তি। যারা তা পারছে না তারা পরম্পরাগত এই শিল্পকে আঁকড়ে ধরেই জীবন-সংগ্রামে টিঁকে থাকার শেষ চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে।

তথ্যসূত্র : ১। অশোক ভট্টাচার্য— বাংলার চিত্রকলা, কলকাতা, ১৯৯৪; ২। খগেশকিরণ তালুকদার— বাংলাদেশের লোকায়ত শিল্পকলা, ঢাকা, ১৯৮৭; ৩। বোরহানউদ্দীন খান জাহাঙ্গীর— বাংলাদেশের লোকশিল্প, ঢাকা, ১৯৮৩; ৪। আশুতোষ ভট্টাচার্য— বাংলার লোক সংস্কৃতি, তৃতীয় মুদ্রণ, দিল্লী, ১৯৯১; ৫। তারাপদ সাঁতরা— পশ্চিমবঙ্গের লোকশিল্প ও শিল্পীসমাজ, কলকাতা; ৬। গুরুসদয় দত্ত— পটুয়া সঙ্গীত, কলকাতা, ১৯৩৯।

চিত্র পরিচিতি : ১। মেলায় পট দেখাচ্ছেন শিল্পী; ২। কালীঘাটের পট : নৃসিংহ; ৩। চক্ষুদান পট; ৪। যমপট (অংশবিশেষ); ৫। দূর্গাপট, মেদিনীপুর; ৬। সুনামীকে বিষয় করে পটচিত্র।